Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 204 – 214
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

কলকাতার কবিগানে সাহিত্য ও সমাজ

বিজয় হাঁসদা
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : bijoyhansda10@gmail.com

Keyword
কলকাতা, কবিগান, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, এন্টনি ফিরিঙ্গি।

Abstract
কবিগান হল যুগের ফসল। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, অন্নদামঙ্গল ও অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের ধারা গুলি যখন মানুষের বিনোদন পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, —ঠিক সেই সময়েই আবার বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের পদধ্বনি শোনা যেতে শুরু করেছে। তখন এই দুয়ের মাঝে কবিগান'ই মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ শাসিত বড় বড় পরগণা গুলি ভেঙে ছোটো ছোটো পরগণায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ইজারাদাররা জমিদারের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় হাতে অভূতপূর্ণ অর্থ এলো। প্রত্যেক ইজারাদারদের নিজস্ব পতিতালয় থাকতো। যার যত বেশি পতিতালয় থাকতো তার সম্মান গৌরব বৃদ্ধি ততই পেত। এই ব্যবসাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতনা। প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের পতিতালয়ের ব্যবসা ছিল। সন্ধ্যার প্রহরে মানুষের পতিতালয় গমন ও কবিগানের আসর দুই মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে দেখা দিল। তথাকথিত বাবু শ্রেণির মানুষ তাদের কাজকর্ম করার পর ক্লান্তি দূর করার জন্য গ্রাম বাংলা থেকে আগত কবিয়ালদের ভাড়া করে নিয়ে যেতে কবিগান শোনাবার জন্য। সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করার পর সাধারণ মানুষ জ্ঞানের কথা বা তত্ত্বের কথা শুনতে জানতে চায় না। শুনতে চায় রসের কথা। সাধারণ মানুষ ও বাবু শ্রেণির মানুষ সেই পথের পথিক। কবিয়ালরা কলকাতার বুকে আসর জমাতে শুরু করল, যা থেকে তখন কার সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়েছে। অপর দিকে আমরা কবিগানকে কি গীতি কবিতার শ্রেণিতে ফেলতে পারি না? হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু প্রমুখ কবিয়ালের গানে অসম্ভব রস বৈচিত্র্য ঘটেছে। গানের মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি কবির যে আকুতি এবং এই আকুতি ভীষণ রকম ভাবে মানবিক ও প্রেমবেদনায় সমৃদ্ধ। রাধার যে সম্পূর্ণ আত্মিক অনুবর্তন গীতিকবিতার ভেতরে থাকতো তার কিছু কিছু লক্ষণ কবিগানের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। কবিয়ালরা রিপুর বিনোদনে সহায়তা করতে গিয়ে নিজেদের অবয়ব বদল করেছে বারবার। বেঁচে থাকার তাগিদ সংগ্রাম এই সবকিছুর মধ্যে প্রত্যেকটি কবিগানের মধ্যে সাহিত্য নিদর্শন পেতে পারি না। কিছু কিছু গান আছে যেগুলি সত্যিই সাহিত্য পদবাচ্য হবার যোগ্য। কিছু গান আছে সেগুলি শুধুমাত্র গান হিসেবে নয়, শুধুমাত্র পদ হিসেবেও পাঠ করা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলি কি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের রসাভাস? এই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব শুধু কি বৈষ্ণব সমাজ বা সম্প্রদায়ের কথা বলে? না। আসলে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' এই সর্বজনীন সার্বিক অনুভব নিজের করে তারপর সকলের করে নেওয়া। আর এই পদগুলির ব্যক্তি বিশেষ না ধরে তাকে সর্বজনীন করে নেওয়া হলে সকল

মানব মানবীর হৃদয় স্পর্শ করবে। যদিও কবিগান নিয়ে সবচেয়ে নির্মম সমালোচনা শোনা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গলায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর জননীর হৃদয়ের আরতি, স্বামী ত্যাগিনী বিরহ বিধুরা গৃহবধূর আরতি, হঠাৎ রাজা, জমিদার, বাবুদের চরিত্রের কীর্তিকলাপ— এই সবকিছুকে একত্রিত করে রেখেছে কবিগান।

Discussion

কবিগান বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক উদ্ভাবন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সংগীতের ধারা বয়ে আসছে প্রবাহমান কাল ধরে। সমুদ্রের জলরাশির কলোকল্লোলিনি শব্দে, ঝরনার বয়ে যাওয়া জল রাশির শব্দে, বাতাসের শন শন শব্দে, বিহঙ্গের কুজনে, আরও কত ধরনের সুরের মূর্ছনায় প্রকৃতি আন্দোলিত। প্রকৃতি আর মানুষকে নিয়ে তৈরি হল সমাজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও পরিবর্তন হতে শুরু করল। এই পরিবর্তনের ধারায় মানুষ প্রকৃতির বুক থেকে সুর নিয়ে তৈরি করল নতুন সুর। গড়ে উঠলো বিভিন্ন ধরনের সংগীতের বিভিন্ন ধারা। সংগীতের যে ধারাটি প্রথমে গড়ে উঠলো তা হল লোকসংগীত। কবিগান হল সেই লোকসংগীত অংশ।

কবে? কোথায়? কে? প্রথম কবিগানের সৃষ্টি করেছেন তা কেউ জানে না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রাচীন কবিয়ালাগণের মধ্যে গোঁজলা গুই, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, রামজী দাস ও রঘুনাথ দাস প্রমুখ কবিদের নাম করেছেন। কবিগান এমন একধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দল গায়ককে প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিত ভাবে পরিবেশন করতে হয়। কবিগানের একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ কবির লড়াই দলের দল পতিকে বলে সরকার বা কবিয়াল। তবে কবিগানের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। সজনীকান্ত দাস মহাশয় সংজ্ঞা নিরূপমের চেষ্টা করেছেন —

> কবি-গানের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তা পাঁচালী, খেউড় আখড়াই, হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপকীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীত, প্রভৃতি নানা বিচিত্র - বস্তুর সংমিশ্রণে 'কবিগান' জন্মলাভ করে।"[১]

উদ্দেশ্য :

কবিগান কেন এখনও আলোচনার দাবি রাখে? তা নিম্নে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

১. আঠারো উনিশ শতকের কলকাতার সমাজব্যবস্থায় পরিবেশ কেমন ছিল তা জানতে হলে কবিগানের রাজ্যে পদার্পণ না করে উপায় নেই।

২. কলকাতার বুকে ইংরেজদের আগমনের ফলে কলকাতার বাবুদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচি-নীতি-অভ্যাস কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা বিশেষ লক্ষণীয়।

৩. বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষ কীভাবে তাদের রুচি ত্যাগ করে অশ্লীল কবিগান গেয়ে জীবন নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিল তার এক জীবন্ত দলিল কবিগান।

৪. কবিগান যেহেতু মানুষকে মনোরঞ্জন করার জন্য গাওয়া হতো, সেহেতু সেখানে তেমন ভাবে সাহিত্য ও সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় না। তবে হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগীর কিছু কিছু গানে সাহিত্য ও সমাজের পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরা পড়েছে। যা কবিগানকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

৫. অধিকন্তু বৈষ্ণব পদাবলি পরবর্তীকালের সাহিত্য ও আধুনিক কবিতার সূচনা লগ্নকে সূক্ষ্ম সুতোর মতো সংযোগ স্থাপন করেছে, যা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিষয়।

কলকাতার কবিগান নিয়ে আলোচনার আগে কলকাতা নগরীর প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। কারণ, কলকাতার কবিগান ও জনপ্রিয়তা কলকাতা নগরীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক ভারতে বিশেষ করে তিনটি নগর কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের উত্থানের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের বিকাশ ও বাজার সমাজের সম্পর্ক সন্নিবদ্ধ। কলকাতা নগরীর উত্থানের পেছনে বাণিজ্যের বড় ভূমিকা দেখা যায়। কলকাতা শিল্প নগরী নয়, বাণিজ্য নগরী

হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এ ছাড়াও কলকাতায় মানুষকে টেনে এনেছিল বর্গি বা মারাঠা আক্রমণের ভীতি। মারাঠা আক্রমণ বাংলার মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ণ ত্রাস। গঙ্গাদাস দত্ত তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' লিখেছেন—

বরগির তরাসে কেহ বাহির এহ।
চতুর্দিক বরগির ডরে রসদ না মিলিএ।।

প্রায় একই সময় ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

বর্গিতে লুঠিল কত কত-সুজন।
নানা মত্তে রাজা প্রজার গেল ধন॥

মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজ দুই ভাগে হয়ে পড়ে। প্রথম জনবিন্যাসে এবং দ্বিতীয় মানুষের নৈতিক সম্মানে। এর ফলে কলকাতার জন্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে কলকাতার যোগাযোগ বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। যেমন, কলকাতা-বক্সার, কলকাতা-দিনাজপুর, কলকাতা-ঢাকা, কলকাতা-বর্ধমান, কলকাতা-বালেশ্বর, কলকাতা-কুলপি। তা ছাড়াও চুঁচুড়া, হুগলি, কামারহাটি, কাঁচরাপাড়া, গুপ্তিপাড়া, খুলনা, নদীয়া, ভগবানগোলা ইত্যাদি। ওই সময় উচ্চবিত্তে বাবু শ্রেণির উদ্ভব হয়। তাদের আমোদ প্রমোদের জন্য উপকরণ হিসেবে কবিগানের উদ্ভব হয় বলাই যায়। উনিশ শতকের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কবিগান যে খুব জনপ্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কলকাতার বুকে কবিগানের জন্ম ইতিহাস তেমন কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। ভারতচন্দ্রের তিরোধান (১৭৬০) পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান (১৮৫৯) পর্যন্ত এমনকি তার পরেও আনুষ্ঠানিকতার প্রবল প্লাবন সত্বেও আখড়াই গান, কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতি সংগীত শিল্প নাগরিক কলকাতা ও শহরতলির জনচিত্তে মাদকতার যে উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল দীর্ঘকাল পরেও তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় জানাচ্ছেন-

> "একদিকে চাকুরি-গৌরব, আর একদিকে Mill, Bentham, Spencer একদিকে দাশু রায়ের পাঁচালী আর একদিকে Shakespeare, Milton Byron : একদিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, আপরদিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরে উপাসনা-সে যেন এক অপূর্ব প্রহসন।"[২]

কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকেই যায় কবিগান কি হঠাৎ করে কলকাতার বুকে আর্বিভাব হয়েছিল? নাকি কবিগান আগমনের জন্য তৎকালীন সমাজের মধ্যে দীর্ঘ পস্তুতি চলেছিল? এ প্রসঙ্গে নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

> "শান্তিপুর ও ফুলিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় আখড়াই সংগীত সংগ্রামের অভিনয় সম্পূর্ণ উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়া গেল। ...কিন্তু ব্যবসার মধ্যে আনিয়া সেই মহলীয় আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম কে করিব লড়াই করিয়া ফেলিল। ...দেশকাল সাহিত্য সামঞ্জস্য রাখিয়া কবিগান শান্তিপুর হইতে নূতন বানিজ্য কেন্দ্র হুগলি চুঁচুড়ার পথ ধরিয়া কলিকাতার নগর জীবনে আপনার স্থান করিয়া লইল। ইংরেজ অনুগ্রহ দুষ্ট, নবাবীয়ানার ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াসী যে জনসমাজ তখন সমগ্র দেশ বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদেরই সাহায্যে কবিগান প্রসার হইতে লাগিল।"[৩]

মধ্যযুগের শেষের দিকে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছোঁয়ায় তৎকালীন জমিদার ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের বাহ্য আড়ম্বর ও অভ্যন্তরিন কালিমাও প্রবল ভাবে আকার ধারণ করতে থাকে। ১৬৯০ সালে ২৪ আগষ্ট জোব চার্ণক সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা নামে তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তথাকথিত কলকাতার অভিজাত ভূস্বামীরা মালিকানাধীন হারাতে থাকে এবং অনভিজ্ঞ ইজারাদাররাই জমিদার হন। ভূস্বামীদের রইল কেবল আভিজাত্যের অহংকার বিদ্যানুরাগ বিত্ত কৌলীন্য। বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ কাল তখন অতীত যুগের স্মৃতি কথায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি ভারতচন্দ্রও তখন পশ্চিম দিগন্তের সমীপবর্তী। কর্ণওয়ালিসের ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে অনেক সাধারণ স্তরের অশিক্ষিত মানুষ ধনকুবের দেউলিয়া জমিদারদের ভূসম্পতি কিনে নিয়ে নতুন অভিজাত হয়ে পড়ে। এই আকস্মিক ধন প্রাপ্তির আনন্দে তারা নবাবীয়ানার সুখ বাসনাকে ত্যাগ করতে পারেনি। অনায়াসলভ্য টাকা তাঁদের বুদ্ধি হীন মস্তিষ্কে অহমিকার বুদ্বুদ সৃষ্টি করল। অনায়াস লভ্য অর্থে অহমিকা এবং নবাবী বিলাস অনুকরণের অপচেষ্টা এই সমস্ত অশিক্ষিত মূঢ় অলস লম্পট অর্থগৃধ্ন অত্যাচারীরাই কলকাতা ও গ্রামবাংলার জনসমাজের বিধাতা হয়ে বসেন। এঁরাই হলেন আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়া কবি, যাত্রা,

পাঁচালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দোলযাত্রা দুর্গোৎসব রাস অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদের প্রধান অঙ্গ হিসাবে এই সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যেই কবি-গায়ক এবং অন্যান সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। ধীরে ধীরে কলকাতাকে স্পর্শ করে ওঠলো কবিগান। আর সেই কূলহীন, তলহীন, জলোচ্ছ্বাসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নবযুগের বাবু সম্প্রদায়।

সাহিত্যে কবিগান : সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগান হয়তো কখনো স্থান পেত না, যদি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গান বিলুপ্ত হবার আগে সংগ্রহ করে না রাখতেন।

> "কবিগানের মধ্যে যে বিশাল রহস্য ভান্ডার নিহিত আছে তা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কেউ মনে করতে পারেনি। এবং ইহার মধ্যে যে অপরিসীম সাহিত্য মূল্য বিরাজমান তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।"[৪]

আঠারো শতকে কলকাতায় কবিগানের যে উদ্ভব ঘটে তা চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষণীয় হয় ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। ওই সময়ের কবিগানের সঙ্গে এমন কিছু প্রতিভা যুক্ত হয়, যা কবিগানকে অসাধারণ একটি শিল্প মাধ্যমে পরিণত করে। কবিগানের মধ্যে শ্রী ভূদেব চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যের দুটি প্রাথমিক লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন-

> ১। "সত্যের নগর মূখিতা এবং ২। সমষ্টি বোধের ঐতিহ্য বিযুক্তি সাপেক্ষতা গীতিকবিতা অত্যন্ত দুর্বল এবং অস্পষ্ট হলেও প্রথম পদক্ষেপ এখানেই লক্ষিত হতে বাধা নেই।"[৫]

কবিগানের সাহিত্যিক মূল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যায়িত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ শুধু কবিগানের কথাতেই নয় ,কবিগানের মধ্যে সুরের বৈচিত্র সৃষ্টি হয়ে একপর্যায়ে কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন রাগরাগিণী যুক্ত হয়। প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান হল– গীতি প্রধান। অষ্টাদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ প্রভাব বর্জিত বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানের প্রভাব অনস্বীকার্য। গীতি প্রধান সাহিত্য ও সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত ক্ষেত্রে দুটি শাখায় বিস্তৃত ছিল গীতিময় কাব্য, যথা পাঁচালী কাব্য এবং গীতি সর্বস্ব শাখা সাহিত্যিক রূপ হল কবিগান। কবিয়ালদের প্রধান কাজ ছিল মনোরঞ্জন করা। তাদের অন্ন সংস্থানের অন্যতম পন্থা। একটা সময় যারা কবিয়ালদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, একটা সময় তারাই পৃষ্ঠপোষকতা পরিহার করে নিয়েছিল। কারণ, তাদের রুচি বদলে যাচ্ছে ইংরেজদের রুচির দাপটে। কবিয়াল পোষকতা পরিহার করে নেওয়ার ফলে কালের একটা সময় গৌরবময় অবস্থান, তার প্রায় পিছিয়ে পড়া অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া অবস্থান। গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের কংক্রিটে আছড়ে পড়া, রিপুর বিনোদনে সহায়তা করা, এতকিছু করতে গিয়ে মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতির চাপে কবিয়ালরা ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যেতে যেতে নিজের অবয়ব বারবার বদল করে নিতে হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদ সংগ্রাম এই সবকিছুর মধ্যে প্রত্যেকটি কবিগানের মধ্যে সাহিত্য নিদর্শন পেতে পারি না। কিছু কিছু গান আছে যেগুলি সত্যিই সাহিত্য পদবাচ্য হবার যোগ্য। কবিয়ালের গানের মাধ্যমে যে ভাব গীতিকবিতার সুর ঝংকার বেজে উঠেছিল তৎকালীন সময়ে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেননি। কালের নিয়মে সাহিত্যের ধারা পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। কবিগান সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমরা কবিগানকে কি গীতি কবিতার শ্রেণিতে ফেলতে পারি না? হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু প্রমুখ কবিয়ালের গানে অসম্ভব রস বৈচিত্র্য ঘটেছে। গানের মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি কবির যে আকুতি এবং এই আকুতি ভীষণ রকম ভাবে মানবিক ও প্রেমবেদনায় সমৃদ্ধ। রাধার যে সম্পূর্ণ আত্মিক অনুবর্তন গীতিকবিতার ভেতরে থাকতো তার কিছু কিছু লক্ষণ কবিগানের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। কিন্তু কিছু কিছু গান আছে সেগুলি শুধুমাত্র গান হিসেবে নয়, শুধুমাত্র পদ হিসেবেও পাঠ করা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলি কি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের রসাভাস? এই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব শুধু কি বৈষ্ণব সমাজ বা সম্প্রদায়ের কথা বলে? না। আসলে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' এই সর্বজনীন সার্বিক অনুভব নিজের করে তারপর সকলের করে নেওয়া। আর এই পদগুলির ব্যক্তি বিশেষ না ধরে তাকে সর্বজনীন করে নেওয়া হলে সকল মানব মানবীর হৃদয় স্পর্শ করবে। গোঁজলা গুইয়ের যে দুটি গান ঈশ্বরগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন তাতে গীতিকাব্যের সুরধ্বনি শুনতে পেয়েছেন —

এসো এসো চাঁদ বদনি।
এ রসে দিবসো কোরো না ধনী।।

তোমাতে আমাতে একটি অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সেই ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।

প্রেমমূলক আখ্যায়িকাহীন শুদ্ধ সংগীতের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভায় উদ্ধৃত সংগীত উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। গুপ্ত কবি কবিগানের এই সুপ্রাচীন কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেছেন। বাঙালি সমাজের চিরকালের সামগ্রী বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে হরু ঠাকুরের যে নিবিড় স্বভাব সম্পর্কের পরিচয় তাঁর রচিত সংগীতবিথীকার ছায়া কুঞ্জের মধ্যে ধরা দেয়, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। সখীসংবাদ এর ক্ষেত্রে কবি-লাজ ভয় শঙ্কিতা সখী বিধুরা মনের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন। তখন মনে হয় এই কাব্যকথা বৈষ্ণব কবিতারি নূতনতর সংস্করণ—

শ্যাম, শুন শুন যাও কে আমি ন রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান করিব শ্রবণ।।

নিত্যদিনের ভাষায় সহজ সরল ধূলিমলিন বাঙালির মানস আঙিনায় এই আবেদনের মূল্য চিরকালীন সম্পদের সমতুল্য। রাম বসুর বিরহের গান গুলি সাহিত্যের চরমসীমা স্পর্শ করেছে। সাধারণ নর নারীর বিরহ বেদনা মানবীয় রূপ লাভ করেছে। রাধা এখানে স্বর্গের দেবী হিসেবে নয়, যেন মর্তের সাধারণ নারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। বিরহ পর্যায়ের গানগুলি আধুনিক জীবনের উত্তাপ ও বেদনায় ফুটে উঠেছে। রাম বসুর বিরহ পর্যায়ের গানগুলির ভাষা অপরিণত ও দুর্বল বটে, কিন্তু এর মত তৃষ্ণাতপ্ত নারীহৃদয়ের লজ্জারুণ মূর্তিটি বড় বেদনার আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। কবিগানের রাধাও কৃষ্ণের প্রেমে কলঙ্কিত হয়েছেন —

রহিলো না প্রেম গোপনে।
হলো প্রকাশিতে ভাল দায়।।
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণো যায়।

উচ্চ শিক্ষার অভাব থাকলেও প্রাচীন কবিয়ালরা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনি ও হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট বুৎপত্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন। প্রাচীনতম কবি গোঁজলা গুই দার্শনিকতার সহজ কবিত্বে সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, এবং নিতাই দাস বৈরাগীর রচনা গুলিতেও দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভাব দেখা যায়। গোঁজলা গুইয়ের একটি পদে প্রেমের দার্শনিক তত্ত্বকে সহজ কবিত্বে প্রকাশ করেছেন —

তোমাতে আমাতে একই কায়া।
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া।।
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া।
মনে মনে ভেবে দেখো আপনি।।

যখন পদগুলি সর্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছত; এক ব্যক্তি থেকে সমষ্টি ব্যক্তিকে ছুঁয়ে ফেলে তখন শুধু অনুভবী কৌশলের কারণে সেই পদগুলি মানব মনে প্রভাব ফেলে। কবি একটি নির্দিষ্ট সময়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ছায়া ফেলেছে। কালের দলিল তো বটেই তার সাথে চিরকালীন মানবীয় বেদনা প্রেম-প্রণয়, ভালোবাসা, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, এমনকি ঐতিহাসিক দিক থেকে তো বটেই, সাহিত্যের দিক থেকেও কবিগান উৎকর্ষের দাবি করতে পারে। কবিগানের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে একেবারে অস্তমিত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা গুলির মধ্যে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নাটকের মধ্যে আমরা দেখি বাড়িতে বাড়িতে মেয়ে কবির আসর বসেছে। '*হুতোম প্যাঁচার নকশা*' তে বারোয়ারিতলায় জমিদার বাগান বাড়িতে খ্যামটা নাচ সহ কবিগানের আসর বসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসের মধ্যে কবিগানের প্রভাব লক্ষ্য করি—

> "বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?' তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন, 'গোবিন্দ অধিকারী' — কেহ 'গোপালে উড়ে'। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতে ছিলেন,তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা 'সখীসংবাদ' এবং 'বিরহ' বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, 'গোষ্ঠ' — কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, 'নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও' — নহিলে শুনিব না।"[৬]

দেবেন্দ্র বোষ্টুমী সেজে কবিগান গেয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন সময়েও কবিগানের জৌলুস কমে যায়নি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী রচনার মধ্যেও এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তখনকার দিনে বাড়ির মধ্যে কীভাবে কবিগানের প্রভাবে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠত তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিয়ালদের জীবন ও কবিগান অবলম্বন কবে 'কবি' উপন্যাস লিখেছেন। এখানে তিনি কবিয়ালদের জীবন নির্বাহ পদ্ধতি এবং তাদের গানের ধরন ব্যক্ত করেছেন। কবিগানের অবক্ষয়ের সেই চূড়ান্ত প্রকাশ আছে পরবর্তীকালের ঝুমুরগানের ক্ষেত্রে ঝুমুরের বিপক্ষ দলের কবিয়ালদের গানে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন সে যুগের কবিয়ালরা তাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে কীভাবে নিতাইয়ের মতই ধীরে ধীরে অশ্লীল রসের যোগানদার হয়েছে। এ সেদিনের যথার্থ চিত্র। এ ধরনের আসর সমাজে চলতে থাকলেও তারণ কবি, ভোলা ময়রার মতো কবি হওয়ার স্বপ্ন যে সমাজের বুকে থেকে মুছে যায়নি তাও লেখক দেখিয়েছেন। আবার 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩) উপন্যাসে দেখি জেলের ভিতরে কয়েদিরা শ্রম ক্লান্তি দূর করতে এবং দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে হৈই হুল্লোড় করে জেলের মধ্যে কবিগানের আসর বসিয়েছে। একে অপরকে রসিকতা করে তারা গান বাঁধে, একজন বলে অন্যজন জবাব দেয়। এইভাবে গান এগিয়ে চলে। কেষ্টা কোমরে হাত দিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গান ধরে —

জেলের মধ্যে কবিগাল হয়ই বারোমাস।
গনশা শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্ট দাস,
আপনারা দেবেল গো সাবাস।

স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর বাংলার এই স্বভাবধর্মের কথাই বলেছেন —

> "কবি অনেক আছে কবির কাব্য শুনবার লোকেরই বরং অভাব, শ্রোতা নেই। ...পাশে পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি সে গান শুনেছি।"[৭]

বাংলা সাহিত্যে কবিগান চিরকালীন বিতর্কিত সাহিত্য বস্তু। অনেকেই কবিগানকে বাংলা সাহিত্যে অনাহূত ও অনাধিকার প্রবেশকারী ধরে নিয়ে কলমের খোঁচায় রক্তাক্ত করেছেন। কবিগান নিয়ে সবচেয়ে নির্মম সমালোচনা শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গলায়। রবীন্দ্রনাথের কলমে কবিগানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্লেষ, বিদ্রুপ ভৎর্সনা কটুক্তি ও নির্ভেজাল সমালোচনা উঠে এসেছে তা বাংলা সাহিত্যে কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্যের কপালে জোটেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' পত্রিকায় লেখেন-

> "বাংলা প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয়। একদিন হঠাৎ গোধূলি সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়-এই কবিগান সেই একসময় বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণ স্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না এখনও তাদের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।"[৮]

কবিগান যে স্বল্প পরমায়ু ছিলনা রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ পেয়েছিলেন জীবন সায়াহ্নে এসে। কথিত আছে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ গুমনামী দেওয়ানের কাছে কবিগান শুনতেন। কবিয়ালরা অনেকেই শিক্ষাবর্জিত ছিলেন এবং সাহিত্যতত্ত্ব ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এদের রুচি খুব মার্জিত ছিল না। মাত্রা জ্ঞানের অভাব ছিল এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে জানতেন না। তথাপি দেখা যায় যে এদের রচনার অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমের যেমন অযত্নসিগ্ধ লাবণ্য, অশিক্ষিত কবিদের সহজ কবিদের রচনা গুলিতেও সেই রূপ–সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য দেখা যায়। যাইহোক যথার্থ বিচারের ক্ষেত্রে কবিগানের যুগ আধুনিক বাংলা কাব্যের জীবন ভূমি।

ইংরেজ প্রভাব বর্জিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা সামগ্রিক পরিচয়ের অনুসন্ধান করতে এসে কবিগানের রাজ্যে না এসে উপায় নাই। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই —

"ভারতচন্দ্রের উত্তরকালীন ইংরেজ প্রভাব বর্জিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কবিগান।"[৯]

কবি গানে সমাজচিত্র :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার কবিগানের অভাবনীয় জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তৎকালীন নাগরিক রুচি ও আমাদের উত্তেজনা। তবে অচলায়তনে ফাটল ধরল। অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থিতিশীল, মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব এক সংস্কৃতি অধিবাসী গ্রামীণ জ্ঞানী হিন্দু সমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর জগতের পরিচিত ছিল অজানা। তাই সর্বজনীন অবসাদ গ্রস্থ বহুসংস্কার বিধি নিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ অচলায়তনের আর এক নাম। বাংলা সমাজ ব্যবস্থায় কবিগানের বিশেষ প্রভাব আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন তথাকথিত বণিক সম্প্রদায় কলকাতার সর্বেসর্বা হয়ে উঠছে তখন তাদের মধ্যে এক অনাহুত পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। গ্রাম বাংলার মানুষ আরও একটু বেশি টাকা উপার্জন ও জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে কলকাতা অভিমুখী হতে থাকে। তবে তারা কলকাতা শহরের চোরাবালির তলে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। এক সময় কলকাতাতে অর্থই হয়ে দাঁড়ালো সর্বস্ব, অর্থই মানদণ্ডের চাবিকাঠি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে হাওড়া, হুগলি ও নদীয়া জেলার মধ্যে কবিগানের আসর জমে উঠতে শুরু করল। শহরে এসে লোককবিরা ক্রমেই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করে, নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাই উনিশ শতকের কলকাতায় দেখা গেল গানের অবতারনার লড়াই পরিবর্তিত হয়েছে কবিগানে। তথাকথিত বাবু শ্রেণির মানুষ কাজকর্ম করার পর ক্লান্তি দূর করার জন্য গ্রাম বাংলা থেকে আগত কবিয়ালাদের ভাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল কবিগান শোনাবার জন্য। সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করার পর সাধারণ মানুষ জ্ঞানের কথা বা তত্ত্বের কথা শুনতে জানতে চায় না। শুনতে চায় রসের কথা। সাধারণ মানুষ ও বাবু শ্রেণির মানুষ সেই পথের পথিক। আস্তে আস্তে ওই সময় হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী কলকাতার বুকে আসর জমাতে শুরু করল যা থেকে তখনকার সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়েছে। এমনকি তখনকার বাবু শ্রেণির মানুষরা কবিয়ালদের নিজেদের বাড়িতে ভাড়া করে রেখে দিতেন। কলকাতায় যারা কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জমিদার নবকৃষ্ণ দেব, গোপীমোহন ঠাকুর শোভাবাজাবের কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্রগণ, বড়বাজাবের মল্লিকরা এবং বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবু এবং লাঠু বাবু। কবিয়ালরা নিজেরা গান রচনা করতেন এমনটা নয়। কবিয়ালদের একটি করে বাঁদনদার থাকতো যারা প্রয়োজন মতো গান তৎক্ষণাৎ রচনা করে দিতেন। নীলমণি পাটানির বাঁদানদার ছিলেন কুকুর মুখে গারো যিনি কেবল মুখে মুখে বড়ো বড়ো ওস্তাদি দলের উত্তর দিতেন। এন্টনি ফিরিঙ্গি বাঁদনদার ছিলেন গোরক্ষনাথ,ভোলা ময়রার বাঁদনদার ছিলেন গদাধর মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, তবে রাম বসু নিতাই বৈরাগী নিজেরাই গান রচনা করতেন। বাঙালির জীবনে শরৎ শেফালী যেমন সত্য কবিয়াল রাম বসুর সংগীত তেমন সত্য। রাম বসু রচিত পদগুলি মানবহৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। জগৎ জননী মহেশ্বরী-শিব বন্দনা গীত গাওয়া কবিয়ালদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রোতারও সেই মানসিকতার অংশীদারি ছিলেন। আগমনী দশভূজার বোধন গান; তার সঙ্গে বাংলাদেশের মাতার আশা-নৈরাশ্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যুক্ত হয়ে গেছে বলে এই গানের স্বাদুতা আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। মেনকা যখন দুঃখে ক্ষোভে উমার দুরবস্থা স্মরণ করে বিলাপ করেন —

গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররানী করুণ বচনে কয়।
উমা মা আমার সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসিনী মৃত্যুঞ্জয়।।

অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি ঘরের দারিদ্র্যের অকৃত্রিমও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে বাংলাদেশের মায়ের বেদনায় যেন উক্তিটি প্রতীকতা লাভ করেছে। মেনকা দীর্ঘ এক বৎসর পর কন্যা উমাকে কাছে পেয়ে পাষাণ হৃদয় স্বামীর কাছে অনুযোগ করে বলেন —

তোমার ত নাই স্নেহ।

একবার ধরো কোলে করো, পবিত্র হোক পাষাণদেহ।।
আহা, এত সাধের মেয়ে আমার মাথা খেয়ে।
তিন দিন বই রাখেন।।

এই গানটির মধ্যে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের মায়ের হৃদয়ের আর্তি। বাল্য বিবাহের জোরে কিশোরী কন্যা বিয়ে দেবার ফলে বাপের বাড়িতে আসতে পারে না। তাই মেনকার মন কন্যার জন্য ব্যাকুল। তিনি তো গিরীশকে বলেছেন যে, উমার সংবাদ নিয়ে আসতে। মা আর মেয়ের দেখা হলে সে কি অভিমান ভরা কান্না; আবার শরতের রৌদ্ররে মতো সে কী আনন্দের ঝিকিমিকি; সেই মান-অভিমানের গানে কখন যে কৈলাসবাসী উমা ও হিমালয় বাসিনীর মেনকা আমাদের ঘরের মা মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েন তা বোঝা যায় না। অতিপ্রিয় এবং পরিচিতি এই 'সপ্তমী সংগীত' যেন বাঙালি জীবনচর্যার ব্যথা - বেদনারদীর্ণ একটি অধ্যায়ের প্রতীক। গিরীশ মেনকার মিলন বিরহ সংবাদ সমগ্র জাতির জীবন নাটক অন্যতম একটি পরিচ্ছেদ-

> "it is not the super human picture of Ideal goodness but the simple picture of a Bengali mother and a daughter that we find in the menoka and Uma of Ram Baus. We seem to hear the tender voice of our own mother, her anxious solitude of her daughter, her weakness as well as strength of affection..."[১০]

বাঙালির দুর্গোৎসবের পটভূমিকায় মা ও মেয়ের সুখ দুঃখের হাসি কান্না অবলম্বন করে কন্যা উমা ও মাতা মেনকাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গান রচিত হয়েছিল তাতে স্বর্গ-মর্ত্য মিলিত হয়েছিল কবিগানের মাধ্যমে। রাম বসুর বেশিরভাগ গানগুলি উমা মেনকা সংক্রান্ত কাহিনি। সেই কাহিনিতে মা ও মেয়ের সম্পর্ক প্রাধান্য পায়। স্বর্গের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে রাম বসু একপর্যায়ে সাধারণ মা ও মেয়ের জীবনকে বাস্তবের পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিগানের ভবানী বিষয়ক ও সপ্তমী গানের মধ্যে মা মেনকা ও উমার মান-অভিমান বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন —

> "গিরিরাজ মহিষীর প্রতি উমার যে অভিমান তাহাতে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক করে না তাহা সর্বত্রই সুমিষ্ট বোধ হয়।...কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া ওঠে।"[১১]

কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরাতে গিয়ে রাজা হয়ে অতীতের বিস্মরণ এই বিষয়টি সে যুগের লোককবিরা যে ভাবে বর্ণনা করতেন, তার ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে অনেক সময়ই ধরা পড়তো কলকাতার এই হঠাৎ রাজাদের বিচার-বিবেচনার ছায়া ও ছাপ । কবিয়াল রাম বসুর গানটিতে দূতী মথুরা থেকে ফিরে এসে রাধাকে কৃষ্ণের পরিবর্তনের কথা শোনান।

"গিয়ে দেখলাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই।
রাইকে নাহি মনেতে।।

তখনকার জমিদার বিত্তবান ব্যক্তিরা বারাঙ্গনা গমন করে নিজের স্ত্রীর কথা প্রায় ভুলেই যেতেন তা এখানে লক্ষণীয়। গোবিন্দ অধিকারী সে যুগের জনপ্রিয় কৃষ্ণযাত্রা বৃন্দাবনে দূতী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে যে গানটি গেয়েছেন তার কথা গুলি খুবই লক্ষণীয় বিষয় —

এখন চিনবে কেন চিন্তামণি,
হয়েছ রাজা পেয়েছ কুবজা
আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কলঙ্কিনী।।

কৃষ্ণের এইসব বর্ণনাতে সে যুগের শ্রোতাদের সহজেই বাবুদের লক্ষণাদি আবিষ্কার করতে পারা যায়। প্রায় নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে কলকাতাতে এসে বড়লোক হয়ে এই বাবুরা তাদের অতীত দারিদ্র্য দিনগুলি ও সামাজিক হীনবস্থা ভুলে যাবার যাৎপরনাই চেষ্টা করতেন। গ্রামে ফেলে আসা পরিবারকে ভুলেই যেতেন। প্রয়োজন হলে তাঁদের ত্যাগ করতেও পিছুপা হতেন না। শহরের নতুন আদব-কায়দা আয়ত্ত করে তাদের এখানেই নব্য প্রাপ্ত ইয়ারা বন্ধু ও রক্ষিতা বারগণিকা গৃহে গমন সবাইকে নিয়েই রাজত্ব করতেন জাত বিসর্জন দিয়ে। বাবু হওয়ার প্রতিযোগিতায় অর্থের লোভে স্বজন-পরিজন ত্যাগ করে কবিগানের মাদকতায় ডুবে থাকতেন। হরু ঠাকুরের একটি গানে দেখা যাচ্ছে তৎকালীন

সমাজে বাবুদের স্ত্রী থাকলেও তারা বারাঙ্গনার সঙ্গে রাত্রি যাপন করছে। তাদের স্ত্রীর অন্তরের যাতনা ধরা পড়েছে এই কবিগানের মাধ্যমে —

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে।
তবে কি হবে সজনী।
লম্পট স্বভাবো তার জানি।।
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী।।

এই পদের মধ্যে রাধিকার হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেয়েছে। এই রাধিকা আসলে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের নারী। স্বামীর কাছে এক ফোঁটা ভালোবাসা সুখের আশা করতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন কলকাতার এই নব্য ধনীদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল তথাকথিত শূদ্র সম্প্রদায় থেকে যারা বংশ পরম্পরায় নির্দেশিত অর্থ ও সামাজিক উভয় গ্রামীণ স্তরেই এঁদের বাবা, পিতামহ অবদমিত ছিলেন। আঠারো শতকের কলকাতার ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এঁদের বংশধর এর কাছে অভাবিত সুযোগের পথ খুলে দিয়েছিল। কলকাতা শহরে তখন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হতে বাজারের গোলাদার আড়তদার মহাজন ও পণ্য বিক্রেতা ক্রেতারা ভিড় করে। এই রাজাদের ভাষা ও পরিভাষা কবিয়ালরা তাঁদের গানে উপাখ্যানের বর্ণনাতেও কাজে লাগাতেন।

কবিয়ালদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হতো যে কোন সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কবির কোনো ছড়া গানের তৎক্ষণাৎ একটা জবাবে। কটু বাক্য প্রতিযোগিতায় নয়, নিয়মের মধ্যে থেকে বাকযুদ্ধ। পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে কবিগানের প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক বলেছেন —

> "গায়ক হিন্দু, শ্রোতাও হিন্দু অথচ দুই দল কবিওয়ালাই হিন্দু দেবদেবী কে যথেষ্ট গালাগালি দেয়।"[১২]

সখীসংবাদ গানেও নায়ক নায়িকা পারস্পারিক জীবনের বিবাহ বহির্ভূত গোপন প্রেম, মান-অভিমান পরিবেশিত হয়েছে। যেমন, শিব পার্বতীর সম্পর্ক বর্ণনায় সমসাময়িক সমাজ ও তাঁর তরুণী ভার্যা ঝগড়াঝাঁটির বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, গাঁজাখোর হতদরিদ্র স্বামী তেমনি বদ মেজাজী লক্ষ্মী ছাড়া স্ত্রী। বারগণিকা গৃহে গমন করে যে নিজগৃহে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেত সে তো বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও বিভাজন দেখা দিয়েছিল। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন —

> "হাটখোলার ধনী গোরাচাঁদ দত্তের নাতি কালিপ্রসাদ আনার বিবি নামে একটি সুন্দরী মুসলমান মহিলাকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজ দুই দলে ভাগ হয়ে যায়।"[১৩]

কবিয়ালরা পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও তারা পুরোপুরি বশংবদ চামচা ছিলেন না। প্রয়োজন হলে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেন। সে যুগের বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা কলকাতার কোন এক কোন এক জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখেন জমিদার বড়ই কৃপণতা করেছেন। ভোলা ময়রা নিমন্ত্রিত কর্তার কিপটে স্বভাবকে ব্যঙ্গ করে তার মুখের উপরে ছড়াকেটে বলেন —

পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি
মাফ করো গো রায় বাবু দুটো সত্য কথা বলি।।

কলকাতা পর্বের সখীসংবাদের পরের নাম ছিল খৈউড়। এই অংশে অশ্লীল প্রসঙ্গের অবতারনা বেশি হত। এই অংশে সাধারণত কোন পৌরাণিক আখ্যান চরিত্র বা অনুরূপ ব্যাপারকে সরস, কৌতুক প্রবণ আদিরসাত্মক ঢঙে উপস্থাপন করা হত। কলকাতার বিলাসী বাবুরা রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে সামনে রেখে অশ্লীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। শ্রোতাদের আগ্রহ এবং কবিয়ালদের যোগ্যতা অনুযায়ী গানের আদিরস ওঠানামা করতো। একবার নিতাই বৈরাগী সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত ভদ্র মানুষের ভিন্ন রুচির গানের চাহিদায় বিপাকে পড়েন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—

> "বিশিষ্ট জনেরা ভদ্র এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। সংবাদ ও বিরহ গানের ... ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম ইহাই ছোটলোকেরা আসরে চিৎকারপূর্বক কহিল-হ্যাদ্ দেখ লেতাই (নিতাই) ফ্যার ঝদি কালক্যুকিলির

(কালো কোকিল) গান ধল্লি তো দো (দুও) দেলাম থাড় (খেউড়) গা। নিতাই তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহাদিগের অস্থিরচিত্তকে সুস্থির করিলেন।”[১৪]

শ্রোতাদের চাহিদা পূরণে কবি শক্তির বদল ঘটলো খেউড় গানে—

দীর্ঘকেশ নারীর বেশ তায় বিশেষ বক্ষদেশ
উচ্চ কি কারণ?
দেখি গণ্ড দুটি পাণ্ডুর বরণ
ওরে প্রাণ প্রাণ রে।।

নিতাই বৈরাগী এই কবিগান গাওয়া মাত্রই শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। শ্রোতারা আনন্দে আরও খেউড় গান গাইতে বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিগানের সম্পর্কে ‘বিকৃত রুচি’ বলে সমালোচনা করেন। পরে বিনয় ঘোষ মহাশয় এই মত পুরোপুরি খণ্ডন না করে বলেন —

“হতভাগ্য স্বভাব কবিরা বাঙালি হটাৎরাজাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে বাধ্য হত পেটের দায়ে কবিগান গেয়ে।”[১৫]

রাম বসুর একটি গানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধিকাকে ছেড়ে মথুরা গিয়েছে কংসকে বধ করার জন্য। কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণ বিনা শূন্য। রাধার কষ্ট, রাধার বেদনা যেন হয়ে ওঠে প্রোষিতভর্তৃকা গৃহবধূর বিলাপ —

মনে রৈই সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হোল না,
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।।

কবিগানের রাজ্য জীবন জয়ের রাজ্য। এখানে সমস্ত মানুষের জন্য সে হিন্দু হোক, বৈষ্ণব হোক, মুসলমান হোক এমনকি বিদেশীদের জন্য কবিগানের দরজা উন্মুক্ত। আমরা নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, হোসেন শেখ, এর কথা আমরা জানি। এন্টনি ফিরিঙ্গির কথাও আমাদের অজানা নয়। এন্টনি ফিরিঙ্গি পর্তুগিজ নাগরিক ছিলেন। ভারতে এসে হরিনাম করলে ভোলা ময়রা তাকে পরিহাস করে। সাহেব স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় নিবেদন করে বলেন —

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে,মানুষ ফিরে, এও কথা শুনি নাই।।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
এই দেখো শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পায়।।

এন্টনি ফিরিঙ্গি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেনি সত্য কিন্তু সর্বধর্মের প্রতি তাহার উদার অন্তরাকাশের প্রতিচ্ছবি আমাদের মুগ্ধ করে। রসিকতা এবং ব্যঙ্গ এই দুই বস্তুর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে সাহেব কবিওয়ালার বাক্‌ চাতুর্যে।

উদ্ভবকালে কবিগানের যে আদল তৈরি হয়েছিল হয়েছিল তা উনিশ শতকের কলকাতাতেই যেন নানা ধরনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। কবিগান অতল সমুদ্রের মতো। তার গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যাবে কত মণিমাণিক্যে ঠাসা তাঁর ভান্ডার। উনিশ শতকের কলকাতায় ইউরোপীয় ধাঁচের সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি হওয়ার কারণে মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের সমন্বয়ে গঠিত কবিগান ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যে কবিগান এক সময় দেশীয় সংস্কৃতি ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে আসছিল ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক কারণে সেই কবি গান স্থূলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলো। বিত্তবানরা আধুনিক ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাটা পড়ল। নতুন পরিবেশে কবিগান যেহেতু পেশা হিসেবে লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারল না। সেহেতু প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতেও তা ব্যর্থ হল। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ কবিগানের কলকাতা পর্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্তির অগ্রসর হতে থাকলো। কলকাতা থেকে কবিগান লুপ্ত হতে শুরু করলেও কবিগানের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হল গ্রাম বাংলায়। কবিগানের স্থায়িত্ব স্বল্পকাল হলেও বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৫
২ বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ. ৩২
৩. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন; ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোপারেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮০ শকাব্দ, ৭ চৈত্র, পৃ. ২৯
৪. হালদার, পরমানন্দ; ভারতবর্ষ পত্রিকা, ৫২তম বর্ষ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখা, কার্তিক-১৩৭১, পৃ. ৭৯১
৫. চৌধুরী, ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৫
৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র; বঙ্কিম রচনাবলী, অশোক বুক এজেন্সি, অষ্টম প্রকাশ, পৃ. ২৩৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর; আমার সাহিত্য জীবন; প্রথম পর্ব, ১৩৭৬, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ. ৫
৮. চৌধুরী, ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৩-৪৪
৯. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন; ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোপারেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮০ শকাব্দ, ৭ চৈত্র, পৃ. ২০
১০. তদেব, পৃ. ৬৮
১১. বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; চতুর্থ খন্ড, মর্ডান এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ. ১১৬
১৩. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত; উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান; অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৩ জানুয়ারি, পৃ. ৫২
১৪. তদেব, পৃ. ১০৩
১৫. তদেব, পৃ. ৫০

গ্রন্থঋণ :

১. বন্দোপাধ্যায় অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫
২. চক্রবর্তীর নিরঞ্জন; ঊনবিংশ শতাব্দী কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, অ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডিয়ান কো অপারেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮০ শকাব্দ, ৭ চৈত্র
৩. বন্দোপাধ্যায় সুমন্ত; উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতী ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৩, জানুয়ারি
৪. চৌধুরী ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, আগস্ট ২০০৯, ১৪১৬ শ্রাবণ, দে'জ পাবলিশিং
৫. মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ; গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, বিশ্বনাথ রায় (সম্পাদিত) পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, ৯ মে
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর; আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম পর্ব, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৬
৭. সিংহ ডক্টর দীনেশচন্দ্র; পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি – সংগীত, দে বুক স্টোর, ১৩৯৭

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

1. Sen Dinesh Chandra; History of Bengali language and literature, Calcutta University, 1911
2. De Sushil Kumar, History of Bengali literature in the nineteenth century (1800-1825), Calcutta University, 1919